জীবন মানেই যুদ্ধ

সনৎ বসু

নদীর চড়া থেকে পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে উপরে উঠছে বিশাল। উপরে কালো পিচঢালা রাস্তা। নানা বাঁক ঘুরে রাস্তা শেষ হয়েছে মুন্সিয়ারিতে।

মুন্সিয়ারি। উত্তরাখন্ডের পিথোরাগড় জেলার প্রান্তিক শহর। সারা বছর দেশি-বিদেশি পর্যটকের আনাগোনা। হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্যকে দু-চোখ ভরে দেখা। হাত বাড়ালেই পঞ্চচুল্লির পাঁচ চূড়ায় বরফ আর মেঘ-রোদ্দারের লুকোচুরি। তার ওপারে ইল্লম গ্লেসিয়ার। যা পেরোলে পাকিস্তান আর চীনের সীমান্ত। নন্দাদেবী সবুজ চাতাল থেকে যা বারবার দেখেও মনের আশ মেটে না।

বিশাল হোটেলে কাজ করে। তেজম পার হয়ে গাড়িচলা রাস্তাটা এঁকেবেঁকে উঠে গেছে পাহাড়ের উপর। সেই রাস্তারই বাঁকে দাঁড়িয়ে হোটেলটা। মাথায় টিনের ছাদ। কাঠের তক্তা দিয়ে ঘেরা দেওয়াল। একপাশে খাড়া পাহাড়। বড়ো বড়ো গাছ। অন্যপাশে গভীর গিরিখাত আর নদী। তার পেছনে আরো পাহাড়ের সারি। সবুজ গাছগাছালি। সারাদিন নানা রঙের খেলা।

তা, দেখতে না-পসন্দ হলেও নয় নয় করে দশ বছর ধরে হোটেলটা চালাচ্ছে বচ্চন সিং। খদ্দেরও কম না। পাহাড়ের এই পথ ধরে যেসব গাড়ি যায় তার ড্রাইভার, হেলপপার, যাত্রীরা দু-দন্ড দঁড়াবেই। হোটেলে পাওয়া যায় না এমন জিনিস নেই। চা, নাস্তা, লাঞ্চ, রোটি, সবজি, চানামশলা, অন্ডা, চিকেন, মাছ ভাজা, মাছের ঝাল। রান্নার স্বাদই আলাদা।

বিশালের বাড়ি নাচানি গাঁয়ে। পাহাড়ের নিচে সেই গাঁ। সারা বছর ফসল ফলে। চাওল, গেহুঁ, মারোয়া। এছাড়াও নাননা সবজি। গাড়ি বোঝাই হয়ে সে ফসল যায় নানা জায়গায়। থল, বেরিনাগ, চকৌরি, মুন্সিয়ারি। কিন্তু গাঁয়ে বিশালের মন বসে না। বাবার তেমন জমি নেই। অন্যের জমিতে কাজ করে। বয়েস হয়েছে। বেশি খাটতে পারে না। তাই কামাই কম। ভাই-বোন দুটো ছোট। মার উপর খুব চাপ। একটা কিছু করা দরকার।

ভাবতে ভাবতে এইট থেকে নাইনে উঠেই স্কুল ছেড়ে দিল বিশাল। গাঁয়ের ভাবো সিংয়ের ভেড়ার ব্যবসা। প্রায় শ'খানেক ভেড়া চরানোর কাজ নিল বিশাল। রোজ সকালে ভেড়ার পাল পাহাড়ের উপরে জঙ্গলে নিয়ে যায়। ভেড়াগুলো ঘুরে ঘুরে

ঘাসপাতা খায়। লাঠি হাতে টিলার মাথায় বসে বিশাল লক্ষ্য রাখে। আবার বিকেল বিকেল সেগুলোকে খোঁয়াড়ে ফিরিয়ে আনে।

কিন্তু ভাবো সিং লোকটা সুবিধের নয়। পান থেকে চুন খসলেই গালিগালাজ করে। ঠিকমতো পয়সাকড়ি দেয় না।

রাগে কাজটা ছেড়ে দিল বিশাল। অগত্যা কী করবে। বিশাল ভাবে। সারাদিন তো চুপচাপ বসে থাকা যায় না। তখনই গাঁয়ে আসে বচ্ছন সিং। বাবার বন্ধুর ভাই। বিশালকে হোটেলের কাজে লাগিয়ে দেয়।

খদ্দেরদের চা-জলের গ্লাস এগিয়ে দেওয়া, টেবিল মোছা, সবজি কাটা, মশলা বাটা-কোনো কাজেই বিশালের না নেই।

কিন্তু সব চেয়ে কষ্ট হয় আধ কিলোমিটার চড়াই ভেঙে ড্রাম ভরে ঝরনার জল বয়ে আনতে। সেই জলেই রান্না, সেই জলই পান, সেই জলেই থালাবাসন ধোয়া। দিনে বার তিনেক কাজটা করতে বিশালের দম বেরিয়ে যায়।

একাজটাও ছেড়ে দিয়ে যখন গাঁয়ে ফিরে যাবার কথা ভাবতে, তখন এক সকালে বচ্ছন সিং তাকে ডেকে খাদের কাছে নিয়ে যায়।

-নিচে কী দেখছিস? বচ্ছন হাসতে হাসতে বলে।

-নদী। বিশাল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

-বাঃ। বচ্ছন পিঠ চাপড়ে দেয় বিশালের। কোনো দিন নদীতে নেমেছিস?

-না।

-নামলেই সোনা। অনেক টাকা। বচ্ছন মিটমিট হাসে।

কিছু না বুঝতে পেরে বিশাল বোকার মতো বচ্ছনের মুখের দিকে তাকায়।

-শোন্, এখানে বেশি ঘুরতে আসে বাঙালীরা। মাছ ছাড়া ওদের মুখে ভাতই ওঠে না। তাই আরো মাছ চাই আমার। নদী থেকে মাছ ধরে আনলেই টাকা দেবো। নগদানগদি। পারবি? বচ্ছন এবার সিরিয়াস।

-দেখি চেষ্টা করে। বিশাল নিজের কাজে মন দেয়।

এর কিছুদিন পর সপ্তাহখানেকের ছুটি নিয়ে গাঁয়ে ফিরে আসে বিশাল।

সঙ্গে যে সামান্য কিছু টাকা এনেছিল দুদিনেই ফুরিয়ে যায়। ভাইবোনদের কিছুই দিতে পারেনি। তার একটা ভালো কাজ চাই। ভালো কাজ মানেই ভালো টাকা। কিন্তু কি করে মিলবে ভালো কাজ। পড়াশোনাও তো বেশিদূর করা হলো না।

দুপুরে মুখ ভার করে নেমে গেলল নদীখাতে। নদীর নাম গোরুড়গঙ্গা। কেউ বলে রামগঙ্গা। পাহাড়ের উপর থেকে নেমে টিলাপাথর ভেঙে নিচের দিকে নেমে গেছে। এখন শীতের সময়। জলের জোগান কম।

হাঁটতে হাঁটতে বালির চড়া পেরিয়ে জলের কাছে দাঁড়ায় বিশাল। তিরতির করে বইছে জলের স্রোত। পরিষ্কার টলটলে জল। নিচটা স্পষ্ট দেখা যায়। ছোট-বড় টিলা ঘিরে জলের ঘূর্ণি। তাতে মাছরা সাঁতরায়, খেলা করে। কেউ কেউ ভেসে যায় স্রোতের টানে অন্য কোনো টিলার উদ্দেশে।

বিশাল একমনে জলের মধ্যে মাছের খেলা দেখে। ছোট বড়ো নানা মাছ। কী নির্ভয়, স্বচ্ছন্দ। আসলে কেউ তো কখনো ওদের গায়ে হাত দেয়নি।

একসময় সূর্য চলে যায় পাহাড়ের আড়ালে। চারপাশে আলো কমে আসে। দু-হাত বাড়িয়ে জাপটে ধরে শীত।

বিশাল উপর দিকে হাঁটা শুরু করে। তখনি অস্ফুট শব্দ শুনে চোখ আটকে যায়। একটা বড়ো মাছ। জল ছেড়ে চড়ায় উঠে লাফাচ্ছে। কালো কুচকুচে শরীর, ছুটে গিয়ে মাছটা ধরে ফেলে বিশাল। মাছটা তখনো লেজ নাড়া। মুখ হাঁ করে।

বিশালের গাঁয়ে মাছের চল নেই। বাড়িতেও কেউ মাছ খায় না। তাই মাছটা আবার জলে ছুঁড়ে দেবে কিনা ভাবছে, তখনি কারো ডাক কানে আসে।

বিশাল দেখে দূর থেকে ছুটে আসছে আর্জুন। বিশালের হাতে কুড়ি টাকার নোট গুঁজে দিয়ে মাছটা নিয়ে নেয়। চলে যাবার আগে বলে যায় আরেকটা মাছ ধরলে আবার কুড়ি টাকা দেবে।

তখনি বচ্চন সিংয়ের কথাগুলো মনে পড়ে। নদী থেকে মাছ ধরে আনলেই টাকা দেবো, নগদানগদি।

অর্জুনকে চিনলেও বাড়ি কোথায় বিশাল জানে না। তবে এটুকু জানে অর্জুন পাহাড়ের ছেলে নয়। ওর বাড়ি সমতলে। কাঠগুদাম নয় হলদোয়ানি। ছোট থেকেই কাজের খোঁজে পাহাড়ে এসে আর ফেরেনি।

পরদিন সকালেই বড়ো রাস্তায় অর্জুনের সঙ্গে দেখা। ট্রেকারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। হাতে বড়ো ব্যাগ।

-আজ কী মাছ ধরলি? বিশাল হাসতে হাসতে জানতে চায়।

-মরাল আর রুহু। অর্জুনও হাসে।

-হোটেলের অর্ডার বুঝি?

অর্জুন হ্যাঁ সূচর মাথা নাড়ে।
-কোথা থেকে ধরলি?
-কেন, নদী থেকে।
-সেকি? এখানে তো জলই নেই। বিশালের চোখে অবিশ্বাস।
এখানে নেই তো কী কী হয়েছে। নাচানি ব্রিজের নিচে চলে যা। সারা বছর জল। ওখানে দুই নদীর সঙ্গম। স্রোতের খুব টান। তাই মাছের আভাব নেই।
-কেউ কিছু বলে না?
-কী করে বলবে, জানলে তো। আর্জুনের মুখে আবার দুষ্ট হাসি।
-আমাকে মাসের ব্যবসাটা শেখাবি অর্জুন? ঘরে খুব অভাব। বিশাল অর্জুনের হাত চেপে ধরে।
-ঠিক আছে, হোটেল ধরা আছে?
-হ্যাঁ।
-কোন্‌টা?
-বচ্চন সিংয়ের হোটেল।
-একটায় হবে না। আরো দু-তিনটে ধর। নইলে পোষাবে না।
অর্জুন কথা রেখেছে। বিশাল এখন তিনটে হাটেলে মাছ সাপ্লাই দেয়। একটি নাচানি, একটি তেজম আর একটা বচ্চন সিংয়ের।
খুব সকালে ওঠে। অর্জুনের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। কাজ সেরে দিনের বাকি সময়টা হোটেলের কাজ করে। বচ্চন সিং তাতে না করে না। করলে যদি কাজটা পুরোপুরি ছেড়ে দেয়। জল টানার ভয়ে কেউ এ হোটেলে কাজ করতে চায় না।
সংসারের হাল একটু একটু করে ফিরছে। বাবা-মার মুখে হাসি। ভাইবোন দুটোর গর পোশাক জোটে।নিয়মিত স্কুল যায়।
মালিককে বলে এক সকালে মামার বাড়ি গিরগাঁও যায় বিশাল। অনেকদিন খবর নেই। পাহাড়ের নিচে বেশ বড়ো গ্রাম। মামা-মামি দুজনেই ফলবাগিচায় কাজ করে। বহুদিন পর ভাগ্নেকে কাছে পেয়ে দুজনে খুব খুশি। যত্ন করে খাওয়ায়। বাড়ির সবার খোঁজ নেয়। সঙ্গে দেয় দু-বোতল মাল্‌টার সরবত।
ফেরার পথে গাড়ি চলা রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করে। দুপুরের সূর্য মাথার উপর। পাহাড়জুড়ে সবুজের উৎসব। দূরে ঝকঝক করে পঞ্চচুল্লির বরফচুড়া।

নিচে ছবির মতো গ্রামের ঘরবাড়ি। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে। কে এম ভি এমের হোটেল।

হোটেলের লন থেকে পেছনে উঠে গেছে পাথরের সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলেই ভভিরথি ফলস্।

পাহাড়ের মাথা থেকে অবিরাম ঝরছে জলধারা। চারপাশ জুড়ে ধারাপতনের শব্দ। নীরব নিস্তব্ধ প্রকৃতি সে শব্দে সর্বদা মুখর। এই ভিরথিকে দেখার জন্য দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসে পর্যটক। ছবি তোলে ক্যামেরায়। তারপর পেটে টান পড়লে হোটেলে ঢোকে।

বিশালও গটগট করে ঢুকে যায় হোটেলের ভেতরে। ম্যানেজারকে মাছ সাপ্লাইয়ের কথা বলতেই মিলে যায় অর্ডার। পঞ্চাশ পিস রুহ। একশো থেকে দেড়শো গ্রাম ওজনের। দরদাম ঠিক করে রাস্তায় নামতেই মিলে যায় বাস।

সে রাতেই অর্জুনের সঙ্গে দেখা করে বিশাল। অর্জুন একশোভাগ অভয় দেয়।

বিশালের মাছ ব্যবসা যখন একটু একটু করে লাভের মুখ দেখছে, তখনি এক রাতে ঘরে পুলিশ আসে। কোমড়ে দড়ি পড়িয়ে থানায় ধরে নিয়ে যায়। থানা লক-আপে অর্জুনকেও দেখে বিশাল।

তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে নেচার লাভার নামের এক এন জি ও। পাহাড়ের জীব-বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র।

বিশাল কী করবে ভেবে পায় না। মাত্র ষোলো বছরেই পুলিশের খাতায় নাম উঠে গেল। মা-বাবা কী ভাববে। কী ভাববে গাঁয়ের লোক। চোর বলে খোঁটা দেবে।

পরদিন সকালেই বড়োবাবুর পা জড়িয়ে ধরে বিশাল। নাক-কান মলে ক্ষমা চায়। আর মাছের ব্যবসা করবে ননা বলে লিখিত মুচলেকা দেয়।

শেষমেষ বড়োবাবুর দয়াতেই সাতদিন পর কোর্ট থেকে খালাস পায় দুজন। ছাড়া পেয়ে মা-বাবার কাছে ফিরে আসে বিশাল।

অর্জুন চলে যায় চকৌরি। ওখানে হোটেল আর রিসর্ট আছে। যে-কোনো একটা কাজ খুঁজে নেবে।

কিন্তু বিশালের আশঙ্কাই সত্যি হয়। গাঁয়ের ছেলেরা ওর সঙ্গে কথা বলে না। বড়োরাও সন্দেহের চোখে দেখে। একই গাঁয়ে চোরের সঙ্গে থাকতে কেই

বা চায়। বিশাল নানাভাবে সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করে। পুলিশ তাকে চুরির জন্য ধরেনি। আর মাছের ব্যবসা পাহাড়ে নিষিদ্ধও নয়।

কিন্তু বিশেষ কাজ হয় না। গ্রামে একরকম ব্রাত্যই থেকে যায় বিশালের পরিবার।

কিন্তু বিশাল যখন গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবার কথা ভাবছে, তখনি লোক দিয়ে খবর পাঠায় বচ্চন সিং। সাড়া না পেয়ে পরদিন নিজেই চলে আসে।

জঙ্গল থেকে জ্বালানি মাথায় করে গাঁয়ে ফিরছিল বিশাল। বচ্চন তাকে ঢালের নিচে দাঁড় করায়।

–কিরে, এভাবে মেয়েদের কাজ করে বাঁচতে পারবি? তুই না পুরুষ? বিশালের হতাশ কন্ঠ।

–আমি দেবো। হোটেলে চল। বৈজুর কাছ থেকে রান্নার কাজটা শিখে নে। বচ্ছন সিং পিঠ চাপড়ে বলো।

–কেন, বৈজু চাচার কী হলো?

–ও দেশে ফিরতে চাইছে। বয়েস তো কম হলো না। আর আছেও সেই প্রথম থেকে।

–কোথায় চাচার দেশ?

–ভাওয়ালি। নৈনিতালের কাছে। ওখানে ফলের আড়ত আছে। কী করবি বল? আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। বচ্চন সিং মোটরবাইকের দিকে পা বাড়ায়।

–আমি কি পারবো। বিশালের মনে দ্বিধা।

–না পারলে এখানে শুকিয়ে মর। বচ্চন বাইকে স্টার্ট দেয়।

–না পারলে এখানে শুকিয়ে মর। বচ্চন বাইকে স্টার্ট দেয়।

–কাল সকালে আসুন। তৈরি থাকবো। বিশাল এবার জোর দেয় বলে।

কথার নড়চড় হয় না যেন। বাইক পাহাড়ের বাঁকে হারিয়ে যায়।

পরদিনই বচ্চনের বাইকে চেপে কাজে যোগ দেয় বিশাল। বৈজুর কাছ থেকে রান্নার আদবকায়দা শিখতে আরও তিন মাস।

দেশে ফিরে যায় বৈজু। নতুন দায়িত্ব নিয়ে সসম্মানে উতরে যায় বিশাল।

জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকে পাহাড়জুড়ে বরফ পড়েছে। সাদা কুচিকুচি বরফের গুঁড়োয় ঢেকে গেছে গাছপালা পথঘাট।হোটেলের সামনে শুয়ে থাকা

কুকুর দুটোকে ভেতরে আশ্রয় দিয়েছে বিশাল। গায়ে চাপিয়েছে চটের বস্তা। আর আছে মোহন। বারো বছরের ছেলেটাকে মুন্সিয়ারি থেকে জোগাড় করেছে বচ্চন সিং। বাবা-মা কেউ নেই। ছেলেটা সোজা সরল। সবসময় মুখে হাসি। কাজেও ফাঁকি দেয় না। তবে ঠান্ডার সময় ঝামেলা করে। ঘুম থেকে উঠতে চায় না। তার জন্য বচ্চনের চড়থাপ্পড়ও খায়।

শীতের সময় পাহাড়ে পর্যটকের আনাগোনা কম। তাই কাজের চাপও কম। দুপুরবেলা রোদে পিঠ ঠেকিয়ে বিশাল তাই বড়ো পড়ে। ব্যাগ থেকে বের করে এইট পাশের রেজাল্ট। বয়েসের প্রমাণপত্র। যত্ন করে আবার গুছিয়ে রাখে। কখন কাজে লাগবে কে বলতে পারে।

কাজের চাপে আগের মতো বাড়ি যাওয়া হয় না। বচ্চন সিং-ই মাসে মাসে টাকা পৌঁছে দেয়। মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হতে চায় মন। নিজেকে কেমন বন্দী লাগে। বিশাল ছটফট করে খাঁচা ভাঙার জন্য।

দেখতে দেখতে দু-বছর পার। বিশালের রান্নার গুণে হোটেলের নামডাকও বেড়েছে। বেড়েছে খদ্দেরের সংখ্যা। নতুন দুটো টেবিল আর চারটে চেয়ার কিনেছে মালিক। এসেছে নতুন ওভেন আর গ্যাস। বেড়েছে আরো একজন কাজের লোক। মাঝবয়সী। গিরগাঁওয়ে থাকে। লোকটা নেপালি। বচ্চন সিং ওকে থাপা বলে ডাকে। থাপাকে রান্নার টুকিটাকি শেখায় বিশাল। একা হাতে আরর কত কাজ করা যায়।

শীত পেরিয়ে বসন্ত। পাহাড় সেজেছে রূপের বাহারে। গাছে রঙবেরঙের ফুল। কতরকমের পাখি। বাতাসে ঝরাপাতার শব্দ। পাহাড় চূড়ায় বরফ আর মেঘঘের লুকোচুরি। রোদের কাঁচা হলুদ বর্ণ।

এসময়েই খবর আসে গ্রাম থেকে। গ্রামে ফৌজি ক্যাম্প বসবে দুদিন। দুশো লোক নেবে। খবর পেয়েই থাপার হাতে রান্নার দায়িত্ব দিয়ে গ্রামে ফপিরে আসে বিশাল। দাঁড়িয়ে পড়ে লাইনে।

দিনের শেষে সব পরীক্ষায় পাস। পরদিন নির্বাচিতের তালিকায় পঁচিশ নম্বরে নাম বিশালের। নিয়োগপত্র হাতে পেয়ে সাতদিনের মাথায় গ্রাম ছাড়ে বিশাল। গন্তব্য গোয়ালদাম।

পাহাড়ের মাথায় ট্রনিং ক্যাম্প। দৌড় ঝাঁপ, শরীরচর্চা। কঠোর অনুশীলন। তারপর বিশ্রাম, খাওয়াদাওয়া।

বিশালের সবকিছু নতুন লাগে। বিকেলে ছুটির পর দাড়ায় পাহাড়ের ভিউপয়েন্টে। সামনে ত্রিশূল শৃঙ্গ। অস্তগামী সূর্যের আলো পড়েছে বরফের উপপর। যেন গলানো সোনা নামছে চূড়ার মাথা থেকে। নিচেই পিন্ডারি গ্লেসিয়ার।

বিশাল মুগ্ধ, শিহরিত। মনে হয় তার মনে আর কোনো দুঃখ নেই, অনুতাপ নেই।

তিক্ত অতীত ভুলে স্বপ্নময় ভবিষ্যতের দিকে পথ হাঁটে বিশাল।